তাওরিয়া ও তাক্বিয়াহ

উল্লেখ্য যে, এই তাওরিয়া ও শী‘আদের তাক্বিয়াহর (تقية) মধ্যে পার্থক্য এই যে, সেখানে পুরাটাই মিথ্যা বলা হয় ও সেভাবেই কাজ করা হয়। যেমন উদাহরণ স্বরূপ, (১) শী‘আদের ৬ষ্ঠ ইমাম আবু আব্দুল্লাহ জাফর, যিনি আছ-ছাদিক্ব বা সত্যবাদী বলে উপাধিপ্রাপ্ত, একদিন তাঁর নিকটতম শিষ্য মুহাম্মাদ বিন মুসলিম তাঁর নিকটে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার জন্য আমার জীবন উৎসর্গীত হৌক! গতরাতে আমি একটি অদ্ভূত স্বপ্ন দেখেছি। তখন তিনি বললেন, তোমার স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা কর। এখানে একজন স্বপ্ন বিশেষজ্ঞ মওজূদ আছেন। বলে তিনি সেখানে উপবিষ্ট

অন্যতম শিষ্য ইমাম আবু হানীফার দিকে ইঙ্গিত করলেন। অতঃপর শিষ্য মুহাম্মাদ বিন মুসলিম তার স্বপ্ন বর্ণনা করলেন এবং আবু হানীফা তার ব্যাখ্যা দিলেন। ব্যাখ্যা শুনে ইমাম জাফর ছাদেক খুশী হয়ে বললেন, আল্লাহর কসম! আপনি সঠিক বলেছেন হে আবু হানীফা। রাবী বলেন, অতঃপর আবু হানীফা সেখান থেকে চলে গেলে আমি ইমামকে বললাম, আপনার প্রতি আমার জীবন উৎসর্গীত হৌক! এই বিধর্মীর (নাছেবী) স্বপ্ন ব্যাখ্যা আমার মোটেই পসন্দ হয়নি। তখন ইমাম বললেন, হে ইবনু মুসলিম! এতে তুমি মন খারাব করো না। এদের ব্যাখ্যা আমাদের ব্যাখ্যা থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। আবু হানীফা যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা সঠিক নয়। আমি বললাম, তাহ’লে আমি আল্লাহর কসম করে তার

ব্যাখ্যাকে সঠিক বললেন কেন? ইমাম বললেন, نعم حلفت عليه انه اصاب الخطأ হ্যাঁ, আমি কসম করে এটাই বলেছি যে, উনি যথাযর্থভাবেই ভুল বলেছেন।'

অথচ এই মিথ্যা বলার জন্য সেখানে কোন ভয়-ভীতির কারণ ছিল না। কেননা উভয়ে ইমামের শিষ্য ছিলেন। উপরন্তু আবু হানীফা তখন সরকারের অপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন।'[18] এটাই হ'ল শী'আদের তাক্বিয়া নীতি, যা স্রেফ মিথ্যা ব্যতীত কিছুই নয় এবং যার মাধ্যমে তারা মানুষকে ধোঁকা দিয়ে থাকে ও প্রতারণা করে থাকে। এই মিথ্যাচারকে ইমাম জাফর ছাদেক তাদের দ্বীনের ১০ ভাগের নয় ভাগ মনে করেন। তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তির দ্বীন নেই, যার তাক্বিয়া নেই *(ঐ, পৃঃ ১৫৩)*।

(২) ব্যাকরণবিদ হুসায়েন বিন মু'আয বিন মুসলিম বলেন, আমাকে একদিন ইমাম

জাফর ছাদিক বললেন, শুনছি তুমি নাকি জুম‘আ মসজিদে বসছ এবং লোকদের ফৎওয়া দিচ্ছ? আমি বললাম, হাঁ। তবে আপনার কাছ থেকে বের হবার আগেই আমি আপনাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম যে, আমি জুম‘আ মসজিদে বসি, তারপর লোকেরা এসে আমাকে প্রশ্ন করে। আমি যখন বুঝি যে, লোকটি আমার ইচ্ছার বিরোধী, তখন আমি তাকে তার চাহিদা অনুযায়ী ফৎওয়া দেই।’ একথা শোনার পর ইমাম জাফর ছাদিক আমাকে বললেন, اصنع كذا فانى اصنع كذا ‘তুমি এভাবেই করো। কেননা আমিও এভাবে করে থাকি’ *(ঐ, পৃঃ ১৭১-৭২)*/অথচ সত্য কখনোই মিথ্যার সঙ্গে মিশ্রিত হয় না এবং সত্য সংখ্যক সর্বদা একটিই হয়, তা কখনোই বহু হয় না। আল্লাহ বলেন, যদি সত্য তাদের

প্রবৃত্তির অনুগামী হ’ত, তাহ’লে আকাশ ও পৃথিবী এবং এর মধ্যস্থিত সবকিছু ধ্বংস হয়ে যেত’ *(মুমিনূন ২৩/৭১)*। বস্ত্তত: এই তাক্বিয়া নীতি শী‘আদের ধর্মীয় বিশ্বাসের অঙ্গীভূত। যা ইসলামের মৌল নীতির ঘোর বিরোধী। কিন্তু তাওরিয়ায় বক্তা যে অর্থে উক্ত কথা বলেন তা সম্পূর্ণ সত্য হয়ে থাকে। যেমন- (১) ইবরাহীম নিজেকে سقيم (অসুস্থ) বলেছিলেন, কিন্তু مريض (পীড়িত) বলেননি। নিজ সম্প্রদায়ের শিরকী কর্মকান্ডে এমনিতেই তিনি ত্যক্ত-বিরক্ত ও বিতৃষ্ণ ছিলেন। তদুপরি শিরকী মেলায় যাওয়ার আবেদন পেয়ে তাঁর পক্ষে মানসিকভাবে অসুস্থ (سقيم من عملهم) হয়ে পড়াটাই স্বাভাবিক ছিল। এরপরেও তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকতেও পারেন। (২) সব মূর্তি ভেঙ্গে তিনি বড় মূর্তিটার গলায় বা হাতে কুড়াল ঝুলিয়ে

রেখেছিলেন। যাতে প্রমাণিত হয় যে, সেই-ই একাজ করেছে। এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কওমের মূর্খতাকে হাতে নাতে ধরিয়ে দেওয়া এবং তাদের মূর্তিপূজার অসারতা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া। তাই মূর্তি ভাঙ্গার কাজটি তিনি বড় মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করেন রূপকভাবে। তাছাড়া ঐ বড় মূর্তিটির প্রতিই লোকেদের ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল সর্বাধিক। এর কারণেই মানুষ পথভ্রষ্ট হয়েছিল বেশী। ফলে সেই-ই মূলতঃ ইবরাহীমকে মূর্তি ভাঙ্গায় উদ্‌বুদ্ধ করেছিল। অতএব একদিক দিয়ে সেই-ই ছিল মূল দায়ী।

(৩) সারা-কে বোন বলা। নিঃসন্দেহে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে দ্বীনী ভাই-বোন। স্ত্রীর ইযযত ও নিজের জীবন রক্ষার্থে এটুকু বলা মোটেই মিথ্যার মধ্যে পড়ে না।

এক্ষণে প্রশ্ন হ’ল, তবুও হাদীছে একে ‘মিথ্যা’ বলে অভিহিত করা হ’ল কেন? এর জবাব এই যে, নবী-রাসূলগণের সামান্যতম ত্রুটিকেও আল্লাহ বড় করে দেখেন তাদেরকে সাবধান করার জন্য। যেমন ভুলক্রমে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়াকে আল্লাহ আদমের ‘অবাধ্যতা ও পথভ্রষ্টতা’ (وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى)[19] বলে অভিহিত করেছেন। অথচ ভুলক্রমে কৃত অপরাধ ক্ষমার যোগ্য। উল্লেখ্য যে, মাওলানা মওদূদীর ন্যায় কোন কোন মুফাসসির এখানে হাদীছের রাবী আবু হুরায়রাকেই উক্ত বর্ণনার জন্য দায়ী করেছেন, যা নিতান্ত অন্যায়।

[18]. ইহসান ইলাহী যহীর, আশ-শী‘আহ ওয়াস সুন্নাহ (লাহোর, পাকিস্তান : ইদারা তারজুমানুস সুন্নাহ, তাবি), পৃঃ ১৬৪-৬৫।
[19]. ত্বোয়াহা ২০/১২১।

কেন‘আনে প্রত্যাবর্তন

ইবরাহীম (আঃ) যথারীতি মিসর থেকে কেন‘আনে ফিরে এলেন। বন্ধ্যা স্ত্রী সারা তার খাদেমা হাজেরাকে প্রাণপ্রিয় স্বামী ইবরাহীমকে উৎসর্গ করলেন। ইবরাহীম তাকে স্ত্রীত্বে বরণ করে নিলেন। পরে দ্বিতীয়া স্ত্রী হাজেরার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন তার প্রথম সন্তান ইসমাঈল (আঃ)। এই সময় ইবরাহীমের বয়স ছিল অন্যূন ৮৬ বছর। নিঃসন্তান পরিবারে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। শুষ্ক মরুতে যেন প্রাণের জোয়ার এলো। বস্ত্তত: ইসমাঈল ছিলেন নিঃসন্তান ইবরাহীমের দো‘আর ফসল। কেননা তিনি বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহর নিকটে ‘নেককার সন্তান’ কামনা করেছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِيْنَ، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلاَمٍ حَلِيْمٍ-

‘(ইবরাহীম বললেন,) হে আমার প্রতিপালক!

আমাকে একটি সৎকর্মশীল সন্তান দাও। অতঃপর আমরা তাকে একটি ধৈর্য্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।' *(ছাফফাত ৩৭/১০০-১০১)*।